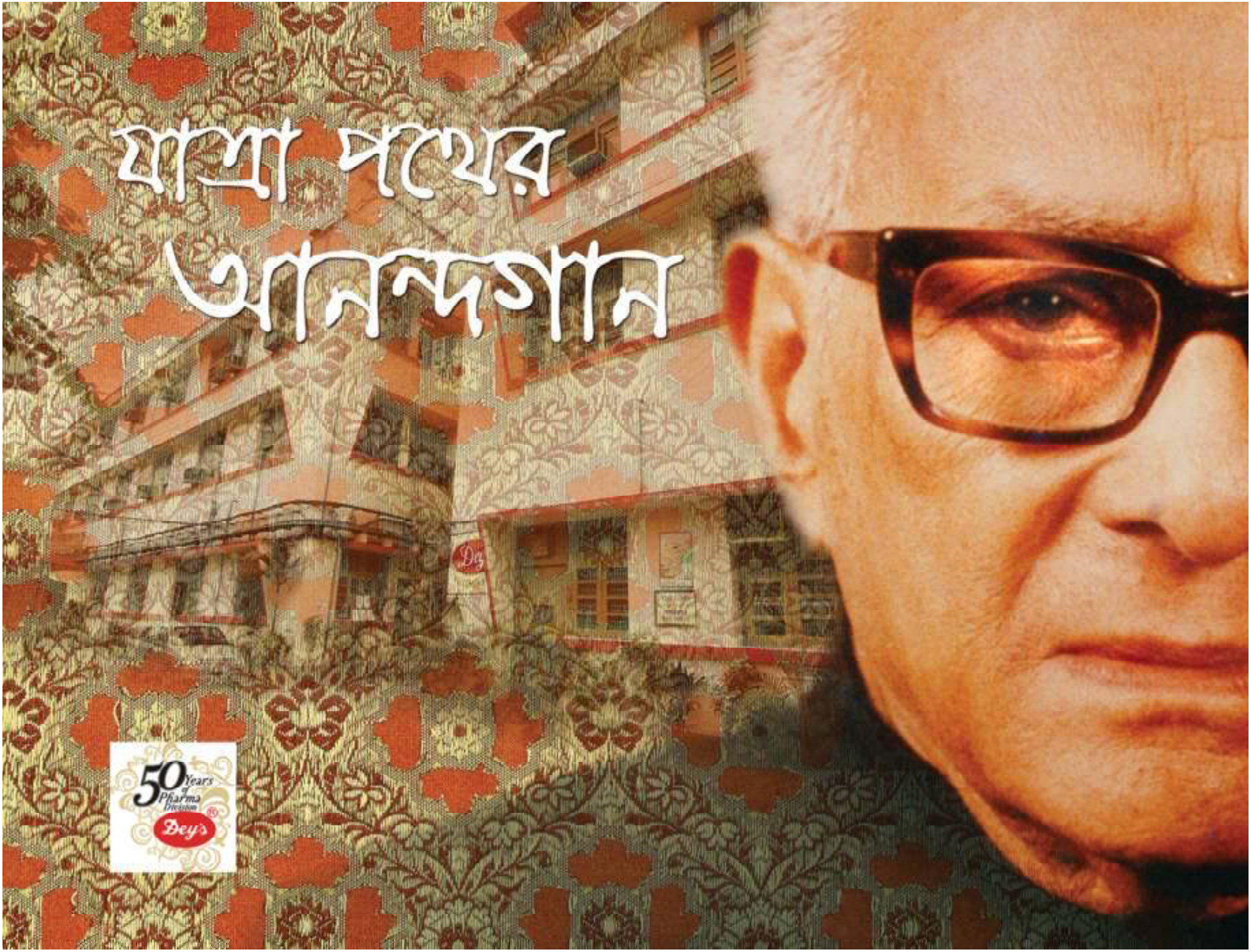

যাত্রা পথের
আনন্দগান
50 Years of Pharma Division
Dey's

দুনিয়ার কাছে ভারতবর্ষ হল সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা ও শিল্পকলার পীঠস্থান। একসময় তার সমস্ত ঐতিহ্যের কেন্দ্র ছিল বঙ্গদেশ। বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আধুনিক সভ্যতা ও সমৃদ্ধির প্রধান স্তম্ভ—শিল্পের বিকাশে অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ। পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্যমী, সাহসী এবং বুদ্ধিমান কয়েকজন মানুষের প্রায় একক অবদানে আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শিল্প ও উৎপাদনশীলতার দিগন্ত। ভূপেনন্দ্রনাথ দে তেমনই এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। তাঁর কথাই আজ আমরা বলবো এবং স্মরণ করবো তাঁরই সৃষ্ট দে'জ মেডিকাল ওষুধ ও প্রসাধনী প্রস্তুতকারক সংস্থার বর্ণময় উত্থানের কাহিনী।

১৯০৭ ভূপেন্দ্রনাথ দে-র জন্ম, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৭, কালীপুজোর আগের দিন, অতি সাধারণ, মধ্যবিত্ত এক বাঙ্গালী পরিবারে। বাবা ফনীন্দ্রনাথ, মা ননীবালা দেবী। উত্তর কলকাতার জোড়াবাগানে এঁদের বাড়ি। দাদা শৈলেন্দ্রনাথ, তিনভাই ধীরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ ছাড়াও সংসারে স্থায়ী ও অস্থায়ী আত্মীয়দের নিয়ে শৈশব কেটেছে ভূপেন্দ্রনাথের। আর্থিক সাচ্ছল্য না থাকলেও সংসারটির হাল শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন ননীবালা। কিশোর ভূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন—সংসারে সচ্ছলতা ফেরাতে উচ্চশিক্ষাকে সম্বল করার সময় নেই।

১৯২০ অতএব তেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পলায়ন, স্রেফ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে।

কিশোর ভূপেন্দ্রনাথের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল একমাত্র মূলধন। ছিল যে কোনও স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও মেলামেশার আশ্চর্য ক্ষমতা। পড়াশোনা হল ম্যাট্রিক পর্যন্ত। প্রবল ঝুঁকি নিয়ে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে বাংলার সুবিশাল বানিজ্য কেন্দ্র কলকাতার পথে শুরু হল তাঁর উচ্চাকাঙ্খী পদচারণা।

১৯২৫ বড়ো দাদা শৈলেন্দ্রনাথ ঢুকে পড়লেন কিলবার্ণ কোম্পানীতে। ধরলেন সংসারের হাল। পড়াশোনার প্রাথমিক পাঠ শেষ করেই তরুন ভূপেন্দ্রনাথ চাকরি পেলেন একটি ওষুধের দোকানে, নিউ মার্কেটের কাছে, তার নাম 'ইস্টার্ন ড্রাগ স্টোরস'। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ সব কাজে চৌখস ভূপেন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে উঠলেন দোকানের সর্বেসর্বা, মালিকের চোখের মণি। একটা সহজাত বিপণণ বোধ এবং সহজে মানুষের মন জয় করার প্রতিভা অল্পবয়সী ছেলেটির জীবনে এনে দিল প্রবল উচ্চাশা। দোকান সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে চলল আরও নানারকম odd jobs। রোজকার করার সাংঘাতিক নেশায় শুরু করলেন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়, বাজারে-হাটে ঘোরাঘুরি। চলল বড়োবাজার, ক্যানিং স্ট্রীটে যাওয়া-আসা। সর্বত্রই অভিজ্ঞতা অর্জন এবং উপার্জন। দেশী-বিদেশী নানা মানুষের ভিড়ে ভূপেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

মন জয় করে নিলেন তৎকালীন কলকাতার বনেদী পরিবারের মানুষদের। অবাধ যাতায়াত শুরু হল হাটখোলার দত্ত বাড়ি, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বাড়ি, লাহাবাড়িতে। সৌম্য কান্তি চেহারা, পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, মার্জিত ব্যবহার এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি—অতি দ্রুত ভূপেন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করে তুললো। দাদার মতোই সামাজিক সুনামের অধিকারী হয়ে উঠলেন ভাই ধীরেন্দ্রনাথ। তিনি তখন ঢুকে পড়েছেন খেলার জাগতে। অনন্য সাধারণ জনসংযোগ রক্ষার সার্থক প্রয়োগে কলকাতার নব্য বিশিষ্ট জনসমাজে জায়গা হয়ে গেলো দুই ভাই-এর।

১৯৩৯ এমনই চলল বছর পনেরো। এর পরেই কলকাতার আকাশে শোনা গেলো যুদ্ধের মেঘ গর্জন। শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই ঘোর সংকটে অভাবনীয় ইতিবাচক এক পরিস্থিতি তৈরি হল কলকাতার ব্যবসা জগতে। ফুলে ফেঁপে উঠলো বাণিজ্য সম্ভাবনা, বিশেষ করে ওষুধের। ইউরোপ, আমেরিকায় তখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্বর্ণযুগ, প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নতুন ওষুধ। তা আসছেও ভারতবর্ষের বাজারে। স্বভাবতই পূর্ব ভারত ব্যবসার তৎকালীন প্রাণকেন্দ্র হওয়ার দরুন যুদ্ধ জর্জরিত কালো আকাশে ওষুধ ব্যবসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রূপোলি বিদ্যুতের মতো। এই তড়িৎ স্পর্শকে সর্বাঙ্গে আহরণ করলেন প্রখর দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ভূপেন্দ্রনাথ।

এদিকে দোকানের বৃদ্ধ মালিক আর পারছিলেন না দোকান সামলাতে। তিনি চাইলেন ভূপেন্দ্রনাথকেই দোকান বিক্রি করতে। প্রখর আত্মসম্মান বোধ কাজ করলো। ভূপেন্দ্রনাথ রাজি হলেন না অবস্থার সুযোগ নিয়ে অন্যের সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে আত্মস্মাত করতে। সিদ্ধান্ত নিলেন—নিজে আলাদা দোকান করবেন। ছোটো করে শুরু করার মতো বিত্ত ততদিনে জমে গেছে তাঁর।

১৯৪১ নিউমার্কেটেই ভাড়া নিলেন ছোট জায়গা, পত্তন হল দে'জ মেডিকাল স্টোরস-এর। লিন্ডসে স্ট্রীটে অবস্থিত আজকের দে'জ মেডিকালের দোকানের এক চতুর্থাংশ ছিলো তার মাপ। ওষুধ, প্রসাধণী এবং সংশ্লিষ্ট সব কিছুই বিক্রি শুরু হয়ে গেলো জোর কদমে। দীর্ঘ দিন বাজার চষে ফেলার অভিজ্ঞতায় দোকান উপচে পড়ল পণ্যে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্কের ফলে ভিড় বাড়লো কাউন্টারে। একবার দোকানে এলে কিছু না কিনে কেউ বেরিয়ে আসতে পারতেন না। এমনই ছিল ভূপেন্দ্রনাথের সম্মোহনী শক্তি। ততদিনে তিনি টেনে নিয়েছিলেন ভাই ধীরেন্দ্রনাথকেও। এছাড়া দোকান সামলাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন রামবাবু ও শ্যামবাবু নামে দুই ভদ্রলোক। কলকাতার সাহেব পাড়ায় একটি বিশিষ্ট ও সম্মানিত বিপনী হিসেবে দে'জ মেডিকাল ততদিনে এগিয়ে গেছে অনেকটা, সমান্তরাল অন্যান্য দোকানদের ছাড়িয়ে। খ্যাতির আর একটা কারণ হল—নিয়মিতভাবে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং দুর্লভ ওষুধের সরবরাহ। বিপুল পরিমানে আমদানী, বিভিন্ন স্তরে বাল্ক-সাপ্লাই—দোকানের সমৃদ্ধি হল অকল্পনীয়। ফলস্বরূপ তৎকালীন কলকাতার বিশিষ্ট মানুষজন ও তাঁদের পরিবারকে নিত্য দেখা গেলো সুনাম অর্জনকারী পুরোদস্তুর এই বাঙালি সংস্থায়।

১৯৪৩ এবারে দাদার হাত শক্ত করতে পরের ভাই রবীন্দ্রনাথও এসে পড়লেন। ঠিক সময়ে, ঠিক মানুষকে, সঠিক জায়গায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্তে ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

খেলোয়াড় ও খেলার জগতের দিকপাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে ধীরেন্দ্রনাথ তখন যথেষ্ট পরিচিত। মোহনবাগান ক্লাবের সর্বময় কর্তা, তুখোড় জনসংযোগ আধিকারীক হিসেবে তিনি তখন-ই সেলিব্রিটি। রাজনৈতিক যোগাযোগও প্রচুর—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ—সবার সঙ্গেই সুপরিচিত। পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছেন পরের ভাই রবীন্দ্রনাথও। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়াশোনা, ভালো ক্রিকেটার, ইউনিভার্সিটি ব্লু। এরপরে যোগদিলেন অমরেন্দ্রনাথ, ছোটো ভাই। তিনজনে দক্ষ হাতে সামলে গেলেন দোকানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। অন্য কোথাও চাকরি করে সনাতন বাঙালি করনিকের জীবিকার সহজ পথে হাঁটতে চাননি দে পরিবারের ভাইরা। অনেকটাই ঝুঁকি ও কর্মোদ্যমকে পুঁজি করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এঁরা। এদের পুরোভাগে ভূপেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব বিপণন জগতের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

দাদা শৈলেন্দ্রনাথ চালিয়ে গেলেন কিলবার্ণের চাকরি। ভাইদের business venture-এর ভবিতব্য কোন দিকে হেলবে এটা কখনওই বোঝা সম্ভব ছিলো না। সুতরাং অপ্রত্যাশিত কোনও পতনে যাতে সংসারের ক্ষতি না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল শৈলেন্দ্রনাথের।

১৯৪৬ সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেশ থেকে উৎপাটিত করার প্রচেষ্টায় নগরবাসী তখন উদ্বেল। বিদেশী শাসকের কুটনীতি-তে ক্ষতি হল কলকাতার। লেগে গেলো দাঙ্গা। তার শিকার হল নগরবাসী। দুর্ভিক্ষ হল। খাদ্যাভাবে, রোগে শুরু হল মৃত্যু—হাজারে হাজারে। এই সময় সর্বত্র একটা ত্রস্ত ভাব। রাতে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফেরা। কিন্তু এত গোলমালেও দে'জ মেডিকাল স্টোর্স-এর ঝাঁপ কোনোদিনই বন্ধ হয়নি।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নির্দেশে ধীরেন্দ্রনাথ দায়ীত্ব নিলেন ময়দানে অবস্থিত রেড ক্রশের রিলিফ সেন্টারের নানা কর্মকাণ্ডের। রবীন্দ্রনাথ সামলে গেলেন দোকান। ভূপেন্দ্রনাথ ভাবছিলেন—এর পর কি করা যায়।

১৯৪৭ দেশ স্বাধীন হল। কালক্রমে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

ইতিমধ্যে পরিবারভুক্ত বিভিন্ন সদস্যকে সংস্থায় ডেকে নিয়েছেন ভূপেন্দ্রনাথ, যথাসময়ে। শেষে চাইলেন বড়ো দাদা শৈলেন্দ্রনাথকে। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে শুধু নয়, অত্যন্ত দক্ষ পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাচ্ছিলো সংস্থা বড়ো হয়ে ওঠায়। শৈলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রতিপত্তিও কম ছিলো না। ময়দানের খেলার জগতে উনি সবার 'দাদাভাই'। হীরালাল দত্তকে সঙ্গে নিয়ে পত্তন করলেন আরোরা ক্লাবের। সেক্রেটারি হলেন সি.এ.বি-র। মুহূর্তে বদলে দিলেন সংস্থার ঢিমে চলা অভ্যাস। খেলার জগতের আর এক দিকপাল ধীরেন্দ্রনাথ তখন মোহনবাগানের সুদক্ষ প্রশাসক। একদিকে খেলা,

অন্যদিকে দে'জ মেডিকালের ব্যবসা—দু নৌকোয় পা দিয়ে দিব্যি চালিয়ে গেলেন দে-পরিবারের ভাই-রা। সপ্রতিভতা ও ইতিবাচক মানসিকতার জোরে তর তর করে এগিয়ে গেল সাফল্যের নৌকো।

১৯৪৯

আমেরিকার বিখ্যাত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ফাইজার উৎসাহী হল স্বাধীন ভারতে তার পণ্য বিক্রি করতে। অত্যন্ত প্রোথিতযশা, ধন্বন্তরী ডাক্তার হিসেবে বিধানচন্দ্র রায় আমেরিকা গেলেন তাদের কারখানা দেখতে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন স্নেহধন্য ধীরেন্দ্রনাথকে। মোক্ষম সময়ে তিনি ফাইজারের কাছে দে'জ মেডিকাল সংস্থার নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে সুপারিশ করলেন। ভারতবর্ষের একমাত্র পরিবন্টকারী হিসেবে ফাইজারের বরাত পেলো দে'জ। সাজ সাজ পড়ে গেলো সংস্থায়। দোকানের দৈনন্দিন বিক্রি ছাড়াও সর্বভারতীয় স্তরে বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনা তৈরি হল। ফাইজারের ওষুধের ব্যাপারে দেশব্যাপি প্রচার ও পুনর্বন্টনের জন্য দ্রুত তৈরি হল ম্যানেজার, সুপারভাইজার, মেডিকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-দের নিয়ে জনা পঞ্চাশের একটি দল। কলকাতা, বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজে যেমন অফিস হল, তেমনই পূর্বভারতে আরও জোর দিতে পাটনা, গৌহাটি, কটকে খোলা হল শাখা। ফাইজারের তৈরি অ্যান্টিবায়োটিক তখন ম্যাজিকের মতো কাজ করছে। পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, সালফা ড্রাগের জনপ্রিয়তার জোয়ারে ওষুধ ব্যবসার দারুন রমরমা। দে'জ-এর হাত ধরে ফাইজারের মিরাকল ড্রাগ টেরামাইসিন ভারতবর্ষে আসার মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, জওহরলাল নেহেরুর বোন।

কিছুদিনের মধ্যেই মূল দোকানের ব্যবসাকে ছাড়িয়ে গেলো ফাইজার-এর ওষুধ পুনর্বন্টনের কাজ। এমন অভাবনীয় সাফল্যে মুগ্ধ, বিস্মিত ফাইজার কোম্পানীর কর্তারা ভূপেন্দ্রনাথকে উপহার দেন একটি হ্যালফ্যাসানের ভারি সুন্দর মোটরগাড়ি। সেই গাড়ি কলকাতা শহরে একটি দ্রষ্টব্য বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণীর বহু মানুষ চেয়ে চড়েছেন সেই গাড়ি।

দোকান, ব্যবসা নিয়ে দে-পরিবার যথেষ্ট ব্যস্ত থাকলেও নিজেদের দৈনন্দিন জীবন, শখ-আহ্লাদ—এদিকেও নজর ছিল সবার। জোড়াবাগানের বাড়ি ছেড়ে এসেছেন অনেককাল। দেওদার স্ট্রীটের নতুন বাড়িতে তখন জমজমাট সংসার।

১৯৫০

শৈলেন্দ্রনাথ সামলাতেন হোম ফ্রন্ট। তাঁর শখ ছিলো থিয়েটারের। অভিনয় করেছেন সরযুবালা, অহীন্দ্র চৌধুরি, ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে। রবিবার বাড়ির বৌদের নিয়ে সিনেমা দেখানো, ছোটোদের সময় দেওয়া—কিছুই বাদ যেতো না। সোয়া ছ'ফিটের মানুষটি ঈর্ষনীয়ভাবে নিখুঁত ছিলেন সময়ের ব্যাপারে। ঠিক দশটায় অফিস। পাঁচটায় নিস্ক্রমণ। তারপরেই হেঁটে ময়দানের মধ্যে দিয়ে সি.এ.বি। সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটা। সোম থেকে শুক্র। এরপর ম্যাডান স্ট্রীটের 'শিল্পশ্রী' ক্লাব, থিয়েটারের আড্ডা। সাড়ে আটটা পর্যন্ত। এর অন্যতম কর্ণধার তখন সবচেয়ে ছোটো ভাই অমরেন্দ্রনাথ। বাড়ি ফিরে সাড়ে নটায় ডিনার। এছাড়া পুজোর সময় সবাইকে নিয়ে ঠাকুর দেখা, জোড়াবাগানে অঞ্জলি এসব তো ছিলোই। কলকাতার ডাক্তার সমাজ, ওষুধ ব্যবসায়ী, খেলার জগতের লোকজন—দেওদার স্ট্রীটের বাড়ি গমগম করত সারা বছর। ল'নে টেনিস, ব্যাডমিনটন চলছে। ভেতরে টেবল টেনিস। আর পার্টি তো লেগেই রয়েছে। পুরো ব্যাপারের উদ্যোক্তা হয়তো ভূপেন্দ্রনাথ, কিন্তু সামলানোর দায়ীত্ব বড়োকর্তার।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

এদিকে বাড়ির ছোটোরা তখন পড়াশোনা করছে। অতএব সরস্বতী পুজো হোত ঘটা করে। কিন্তু জৌলুসে ছাপিয়ে যেতো অন্নপূর্ণা পুজো। সকালে পুজো। সন্ধ্যায় আরতি। ম্যারাপ বেঁধে ব্যবস্থা হত খাওয়ার। নিজের হাতে প্রসাদ বিতরন করতেন শৈলেন্দ্রনাথ। তারপর হাজার লোকের খাওয়া। রাত সাড়ে বারোটা থেকে যাত্রা শুরু। নিজে অভিনয় করতেন সারা রাত, চারদিক খোলা মঞ্চে। পরদিনটা অন্য দিনের থেকে আলাদা হত না। তাঁর এই অফুরন্ত জীবনিশক্তির রহস্য আজও অজ্ঞাত।

১৯৫৩

ফনীন্দ্রনাথের দেহাবসান হল ১৯৫৩ সালে। জীবৎকালে রাশভারি মানুষটি কখনোই মাথা গলান নি ছেলেদের কর্মকাণ্ডে। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী ননীবালা বারণ করেছিলেন প্রথামত মস্তক মুণ্ডনের। কারণ তখনকার সায়েব-সুবো অধ্যুষিত ব্যবসায়িক মহলে সেটা অস্বস্তিকর দেখাতে পারে।

১৯৫৬ সালে ফাইজার নিজেরাই ব্যবসা হাতে নিতে চাইলো ভারতের মাটিতে। কিন্তু এর ফলে দে'জ মেডিকাল নিয়োজিত পঞ্চাশ জনের চাকরির ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। অন্য কেউ হয়তো এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে ভেঙে পড়তেন। সাহসী ভূপেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিলেন—ওদের চাকরি বহালই থাকবে কারণ ফাইজারের পশ্চাদপসরণের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উৎসাহ দিলেন ভূপেন্দ্রনাথকে। বললেন, 'এবারে নিজে করো। তোমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। দেশ স্বাধীন। বাজার তৈরি, অতএব আর দেরী নয়। ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

১৯৫৬

ঠিক হল, দোকানের পিছনে একটা ছোট্ট ঘরে তৈরি করা হবে ওষুধ। দোকান সংলগ্ন ডিসপেনসারি তো ছিলোই। আনা হল ট্যাবলেট তৈরির মেশিন। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ফার্মেসী বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র সাধন মজুমদারকে নিয়োগ করা হল প্রযুক্তিগত দিকটা সামলানোর জন্য। শুরু হয়ে গেলো সালফা ড্রাগ তৈরি। মনে রাখা দরকার, এই ছোট্ট উৎপাদন সাফল্য এবং ফাইজারের ওষুধ পুনর্বন্টনের অভিজ্ঞতাই ভূপেন্দ্রনাথকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলো ভবিষ্যতের বড়ো কাজের।

ভূপেন্দ্রনাথ দিল্লী গেলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের আবেদন করতে। ফরমান এলো স্বাস্থ্যমন্ত্রির তরফ থেকে। বলা হল, 'ওষুধ তৈরি করে দেখাও'।

ঝুঁকি নিতে কোনোদিনই পিছপা হননি ভূপেন্দ্রনাথ। বণ্ডেল রোডের পাশে আট বিঘে জমি কিনে ফেললেন পূর্ব পরিচিত দত্ত পরিবারের কাছ থেকে। সময় লাগলো ঠিক তিন দিন। প্ল্যান তৈরি হয়ে গেলো কারখানার। এসে গেলো প্রয়োজনীয় মেশিন পত্র। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় সুষ্ঠু ভাবে সব তৈরি হয়ে গেল। রেডি হল ওষুধের প্রথম ব্যাচ। তা নিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দিল্লীর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফেরৎ গেলেন সাত মাসের মধ্যে। সম্পূর্ণ হতবাক, স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না দিয়ে পারল না।

১৯৫৮

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৮। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বোধন করলেন বণ্ডেল রোডের দে'জ মেডিকাল ফ্যাকট্রি। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সার্বিক উৎসাহ দান এবং পৃষ্ঠপোষকতা ভূপেন্দ্রনাথ মনে রেখেছিলেন সারাজীবন। দেওদার স্ট্রীটের বসতবাড়িতে বাংলার মনীষিদের সারি দেওয়া তৈলচিত্র শোভা

পেত। তার শুরু হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়-কে দিয়ে। শেষে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এই মুহূর্তে বণ্ডেল রোড ফ্যাকট্রির লাইব্রেরিতে ভিজিটরস্ বুকের প্রথম পাতায় ডাঃ রায়ের সইটি সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

আদ্যোপান্ত বাঙালি, সাবেকী মেজাজের মানুষ ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। দেশজ সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিলো অটুট। কিন্তু ওষুধ প্রস্তুতিতে সেরা ফলাফল সুনিশ্চিত করতে আধুনিকতম বিদেশি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বিশ্বাস করতেন। বিভিন্ন সময়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের এনেছেন কোম্পানীর প্রযুক্তিকে আন্তর্জাতিক মানে ধরে রাখার জন্য।

১৯৬০

একবার ইটালির স্বয়ংক্রীয় মেশিন 'জানাসি' কেনার উদ্যোগ নিলেন তিনি। সেই সময় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য পাশ করা এক যুবক এসেছিলেন চাকরির প্রয়োজনে। দু-দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে ছেলেটিকে ইটালি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলা হল। কোট-প্যান্ট, পাশপোর্টের ব্যবস্থা করেই তাকে নিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ হাজির হলেন জানাসির ফ্যাকট্রিতে। কেনা হল সেই ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন। পূর্ব পরিকল্পনা মত নিজে লাঞ্চের টেবিলে ব্যস্ত রইলেন বিজনেস টক-এ। বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার শ্যেন দৃষ্টিতে বুঝে নিলো জানাসি

জানাসি

মেশিনের চালানোর নিয়ম ও অন্যান্য নাড়ী নক্ষত্র। সেই মেশিন আজও দিব্যি চলছে বণ্ডেল রোডের ফ্যাকট্রিতে।

ভূপেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ

স্টেরাইল পেনিসিলিন ইঞ্জেকশানের অত্যাধুনিক জার্মান 'স্ট্রুঙ্ক' মেশিন কেনা হল ১৯৬২-তে। পেনিসিলিন তৈরির পিছনেও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উৎসাহ ছিল। এটিই পূর্বভারতে প্রথম সম্পূর্ণ অটোম্যাটিক পেনিসিলিন প্লান্ট।

১৯৬২

প্রায়ই বিদেশে যেতেন ভূপেন্দ্রনাথ, মূলত সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য। ইংল্যান্ডে তৈরি 'ম্যানেস্টি' মেশিন এসেছিলো ১৭ টি। এছাড়া এনেছিলেন অতি দ্রুত উৎপাদনকারী 'রোটাপ্রেস'। কখনও কখনও নিজের পরিবারকে নিয়ে গেছেন বিদেশে। কিন্তু স্রেফ ভ্রমণ নয়, কোনও না কোনও ব্যাবসায়িক কারণ থাকতোই। এমনই এক বিদেশযাত্রার শেষে ১৯৬৪-র ১লা জানুয়ারী কলকাতায় ফিরে দেখলেন দাদা শৈলেন্দ্রনাথ দেহান্তরীত।

১৯৬৪

অনেক ক্ষেত্রে, দেশজ প্রযুক্তিকে চাইতেন দামের সুবিধা এবং সমান কর্মক্ষমতার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে। ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গোপাল রায়ের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বহু লিকুইড ফিলিং লাইন তৈরি করেছেন তিনি। আরও অনেক উদ্যমী বাঙালিকে তিনি সাহায্য করেছেন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হতে। তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আজও অটুট। ফলে স্থানীয় বহু মানুষ কাজের সুযোগ পেয়েছেন, সমৃদ্ধ হয়েছে দেশজ শিল্প।

ভূপেন্দ্রনাথের মতো অজস্রবার বিদেশ যাত্রা করেছেন ধীরেন্দ্রনাথও। তবে শিল্পের প্রয়োজনটা অনুধাবন করা, তার সেরা সমাধান বার করার সিদ্ধান্ত বরাবরই নিয়েছেন দাদা। তাকে বাস্তবায়িত করার মূলে সবসময় বাড়ানো থাকতো ভাই-এর হাত।

ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন গুণের বিচার সবচেয়ে জরুরী ঠিকই কিন্তু দর্শনের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা যায় না। ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের ওজন প্রতিপক্ষকে না বোঝাতে পারলে ভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক ডীল-এ সফল হওয়া শক্ত। বম্বে গেলে উঠতেন তাজ হোটেলে। লণ্ডন গেলে গ্রসভেনর হাউসে। অথচ কলকাতায় চড়তেন সাধারণ ফিয়াট গাড়ি। সাজসজ্জায় পরিচ্ছন্নতা বরাবরই ছিল। কিন্তু লোকদেখানো বাহুল্য কখনওই ছিল না। প্রথম জীবনে ধুতি পাঞ্জাবী, পরে শার্ট। বাড়িতে গরম কালে গেঞ্জি ও লুঙ্গি। শীতকালে বিখ্যাত বালাপোশ। ভালোবাসতেন শৌখিন খাবার। আরও ভালোবাসতেন খাওয়াতে। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে কেউ কলকাতায় এলে দেওদার স্ট্রীটের বাসভবনে খাওয়াদাওয়াটা একেবারে বাঁধা ছিলো। দাদার মতোই সবাইকে নিয়ে চলার ইচ্ছে ছিলো ভূপেন্দ্রনাথের। বাড়ির সবাইকে নিয়ে ভালোবাসতেন 'ফারপোজ' বা 'স্কাইরুমে' খেতে। অফিসের লোকজন হলে বেঙ্গল ক্লাব। যে কোনও অভিজাত ব্যাপারে আগ্রহ ছিল। সিনেমাভক্ত ছিলেন ভয়ানক। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অতি প্রিয় দূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কানন বালা, প্রমথেশ বড়ুয়া। আবার হলিউড-এর পছন্দ 'প্রিজনার অফ জেণ্ডা' খ্যাত ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস। পরবর্তীকালে উত্তম-সুচিত্রাও বাদ যাননি ভালোলাগার তালিকা থেকে।

সবার প্রিয় 'মেজদা'-র ব্যক্তিগত আকর্ষন ছিল অপ্রতিরোধ্য। দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতার গল্প শুরু করলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত সবাই। আসতেন উত্তমকুমার। প্রায় প্রতি সন্ধ্যার আড্ডায় হাজির হতেন পাহাড়ী সান্যাল, বসন্ত চৌধুরি, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, চূনী গোস্বামী এবং আরও বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। বহুবার এসেছেন দেবব্রত বিশ্বাস, গান শুনিয়েছেন দে'জ-এর ঘরোয়া অনুষ্ঠানে।

উত্তমকুমার ও ধীরেন্দ্রনাথ

এছাড়া ফ্যাকট্রিতে বিশ্বকর্মা পুজো হোত মহা ধুমধাম করে। সেখানে গান শুনিয়ে গেছেন হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ভূপেন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়েই উত্তমকুমার প্রযোজিত 'কাল তুমি আলেয়া' ছবির অংশবিশেষ চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল বণ্ডেল রোডের ফ্যাকট্রিতে। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ভারত ভ্রমণের অবকাশে তাঁর নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন দুই উদ্যোগপতি ভাই শৈলেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ।

রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

ষাটের দশকের সবটাই কেটে গেছে ব্যবসায় উত্তরণের মসৃনতায়। দুজন প্রখ্যাত মানুষের ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ ও দে'জ মেডিক্যালের ইতিহাস গৌরবান্বিত হয়েছে। পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ভারতবর্ষে আসেন ১৯৬০ সালে। তাঁকে সরাসরি আমন্ত্রণ জানান ভূপেন্দ্রনাথ, বণ্ডেল রোড ফ্যাকট্রিতে পেনিসিলিন উৎপাদন দেখার জন্য। নোবেলজয়ী এই প্রবাদপ্রতীম বিজ্ঞানীকে কি উপায়ে তিনি রাজি করিয়েছিলেন সেটা আজও রহস্যাবৃত। কিন্তু সময়ের অভাবে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং আসতে পারলেন না। হতোদ্যম না হয়ে তিনি তাঁকে ধরে ফেললেন বম্বেতে, তাজ হোটেলে। ফ্লেমিং কথা দিলেন অল্প সময়ের জন্য যাবেন দে'জ-এর বম্বে অফিসে। কথা রেখেছিলেন তিনি। আর এক নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী—সেলম্যান ওয়াক্সম্যান, টি.বি.র ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন-এর জনক, ভারতে এসেছিলেন ১৯৬৪ সালে। উনি দেখে গেছেন বাঙালি শিল্পোদ্যোগির সফল প্রয়াস।

১৯৬৪

এই সময়ে এলেন রামানুজ রায়, একটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানী থেকে। আধুনিক প্রথায় সেলস ও মার্কেটিংকে ঢেলে সাজালেন তিনি। সারা দেশময় ছড়িয়ে গেল দে'জ-এর মার্কেটিং নেটওয়র্ক। জনসংযোগে ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা।

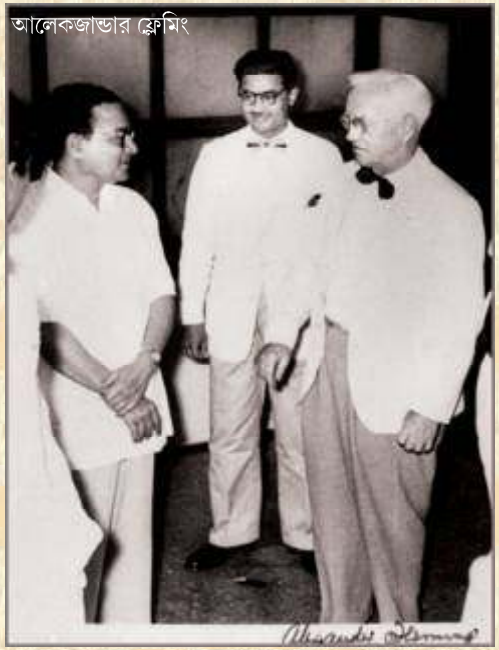
আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

এই সময় খেলার জগতে আলোড়ন শুরু হল কলকাতায়। ১৯৬৪ সালে মোহনবাগান ক্লাবের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে আয়োজন করা হল দারুন অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তা অবশ্যই ধীরেন্দ্রনাথ। হাঙ্গেরির টাটাবানিয়া ফুটবল টিম এল খেলতে। তার সঙ্গে ক্রিকেটের মহা তারকা সমাবেশ—কলিন কাউড্রে, গারফিল্ড সোবার্স এবং আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের শুরু হল মশাল দৌড় দিয়ে, মিনি অলিম্পিক স্টাইলে। বাজির খেলা এবং খাওয়া-দাওয়া সহ এমন ফ্যানফেয়ার কলকাতা আগে দেখেনি কখনও।

১৯৬৭

কোম্পানীতে প্রথম সমস্যার সৃষ্টি হয় ১৯৬৭ সালে। কংগ্রেস সরকারের পতনের পর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলো যুক্তফ্রন্ট। চিফ মিনিস্টার অজয় মুখার্জি। দেশে ক্রমাগত শরণার্থিদের আগমন, খাদ্য আন্দোলন, পুঁজিবাদী শিল্পপতিদের বিরুদ্ধাচারণ করা শ্রমিক সংগঠনের চাপে মুশকিলে পড়লো কমবেশি সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন তৈরি হল বণ্ডেল রোড ফ্যাকট্রিতে। কিছুটা অরাজকতা শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন অংশে। মার খেতে শুরু করলো উৎপাদন। গণ্ডগোলের আগুনের আঁচ লাগলো সবারই গায়ে। হরতাল, ঘেরাও-এর আবহে ক্ষতিগ্রস্ত হল পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ভবিষ্যত। অনর্থক গা জোয়ারি না করে গঠনমূলক আলোচনায় বসলেন দু-পক্ষ। ভূপেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ মাথা দিলেন গভীরভাবে। আলোচনা ফলপ্রসূ হল। সবার সদিচ্ছায় ফ্যাকট্রিতে একদিনও উৎপাদন স্তব্ধ হয়নি। এই সময়ে অতি দক্ষতার সঙ্গে সবরকম সমস্যা সামলেছেন অশোক কুমার লাহিড়ি। এরপর যোগ দেন দিলীপ মিত্র। যার দায়ীত্ব ছিলো প্রায় ফায়ার ব্রিগেডের মতোই।

১৯৬৯

নকশাল আন্দোলন তখন মধ্যগগনে। হিংসার আগুনের উন্মত্ততায় সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে পড়ল সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। কিন্তু এত অশান্তির মধ্যেও ফ্যাকট্রি চলেছে স্বাভাবিক ছন্দে। দোকানও খোলা থেকেছে প্রতিদিন। রাজনৈতিক স্তরে কথাবার্তা বলা ও কারখানায় শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে ধীরেন্দ্রনাথের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এই সময়ে। দীর্ঘদিনের জনসংযোগ এবং জনপ্রিয়তার কারণে রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাতায়াতে কোনও বাধা ছিল না তাঁর।

দে'জ মেডিকাল ফ্যাকট্রি ছাড়াও ভূপেন্দ্রনাথের আর একটি উদ্যোগ ছিল 'ডেসিকেম'। এখানে ঠিক হল ক্লোরামফেনিকল তৈরি হবে বাল্ক অবস্থায়। আমদানীকৃত মালের খরচ কমানোর জন্যই এই উদ্যোগ। সংস্থাটি হল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। হাঙ্গেরির প্রযুক্তিতে তিন বছরে তৈরি হল ডেসিকেম। কিন্তু দেখা গেল লভ্যাংশ খুবই কম। পরবর্তীকালে ডেসিকেমকে জুড়ে দেওয়া হয় মূল সংস্থার সঙ্গে, ১৯৮৭ সালে।

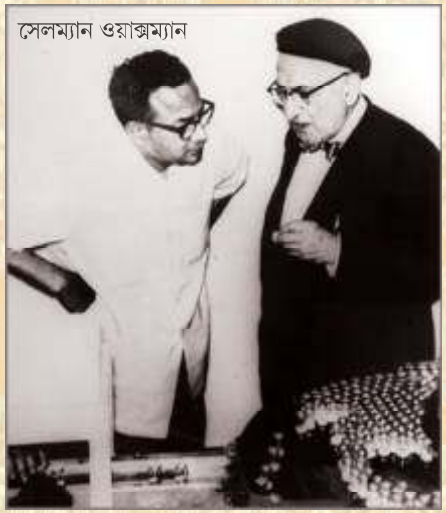
সেলম্যান ওয়াক্সম্যান

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎই দেহ রাখলেন মা ননীবালা। ২১শে জুলাই। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল ওই একই দিনে। মানুষ প্রথম পা রেখেছিল চন্দ্র পৃষ্ঠে। মায়ের অসীম প্রভাব ছিল ভূপেন্দ্রনাথের জীবনে। সারাদিনের সবকিছু সন্ধ্যায়

ননীবালা

মা-কে না জানালে শান্তি হত না তাঁর। এরকমই এক সন্ধ্যায় মা-কে জানালেন, ফ্যাকট্রিতে শুরু হচ্ছে ক্যান্টিন। নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে। মা বললেন, 'খাওয়াবি যখন, পয়সা না-ই বা নিলি।' মায়ের কথা রেখেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। সেই ফ্রি ক্যান্টিন আজও চলছে।

উৎপাদন আরও অনেক বেশি বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তখনই ভূপেন্দ্রনাথের মাথায় আসে কলকাতার বাইরে অন্য কোথাও আর একটি ফ্যাকট্রি তৈরি করার কথা । উত্তরপ্রদেশ সরকার আমন্ত্রণ জানায়, সহজ এবং অনুকুল পরিস্থিতিতে শিল্প স্থাপনের। ঠিক হল কারখানা তৈরি হবে এলাহাবাদের কাছে নৈনিতে, সাল ১৯৭১।

১৯৭১

শুরু হল সপ্তাহে একাধিকবার নৈনি যাওয়া আসা। শুরু হল ফ্যাকট্রি তৈরি করা। তার সঙ্গে চলল বার্ণেট হোটেলে সান্ধ্য আড্ডা। এলাহাবাদের বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ। আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বভূমিতে অশান্ত পরিস্থিতি স্বত্ত্বেও অন্যত্র ফ্যাকট্রি সৃষ্টির কাজটা করে গেলেন স্বাভাবিক ছন্দে। জীবনের মূল স্রোত থেকে কখনও মুখ ঘুরিয়ে না নেওয়ার অনমনীয় ক্ষমতা ছিল তার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের আগুনটা দেখা যেতো কম। কিন্তু খুব কাছের মানুষরা প্রতিনিয়ত টের পেতেন অন্তরের মহা উত্তাপ। আস্তে আস্তে হয়তো অনেকটাই ঢুকে পড়ছিলেন একটা খোলসের মধ্যে, কারণ আবরণটা জরুরি ছিল।

প্রথাগত শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে না পারায় একটা আক্ষেপ ছিল তাঁর। হয়তো সেই অভাব পূরণ করার তাগিদেই প্রতি রাতে নানা ধরণের বই ছিল তাঁর সঙ্গী। বয়স নির্বিশেষে তিনি সম্মান করতেন সংস্কৃতিবান বিদ্বজনদের। ওনাকে কেউ কখনও প্রণাম করতে চাইলে মুখে একটাই কথা ছিল, 'God bless you.'

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরল । মুখ্যমন্ত্রী হলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়। রাজ্য জুড়ে হিংসাত্মক ঘটনার আগুন ততদিনে অনেকটাই প্রশমিত। ফ্যাকট্রিতেও বইতে শুরু করেছে স্বস্তি-র বাতাস। শেষ কয়েক বছরের উৎপাদন ঘাটতি মেটাতে বদ্ধ পরিকর হয়ে সবাই নেমে পড়ল কাজে। দে'জ মেডিকালের শুরু থেকে দ্রুত উত্থান এবং রাজনৈতিক ডামাডোলে হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো—এর ফলে অনেকটাই প্রশাসনিক ঢিলেমি এসে গিয়েছিল। দরকার পড়ল সবটাকে শক্ত করে বাঁধার।

১৯৭২

এলেন মিস্টার মালভানিয়া। আধুনিক শিল্প সঞ্চালনায় পারদর্শিতা দেখালেন প্রতিটি স্তরে। খোলনলচে বদলে, পুরোনো ঝরাপাতা সরিয়ে, নতুন কর্মপদ্ধতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল তাঁর নেতৃত্বে। তার সঙ্গে চলল নানা ধরণের সংস্কারের কাজ। পার্সোনাল বিভাগ ঢেলে সাজাতে নিয়ে আসা হল এস. কে. দাশগুপ্তকে। ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিকদের যোগসূত্র সুদৃঢ় হল। উৎপাদনশীলতার উন্নতিকল্পে এলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার জে.পি ঘোষ দস্তিদার। উন্নত উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল অতিরিক্ত রোজকারের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতেই।

১৯৭৪

ফ্যাকট্রিতে নানা সমস্যা চললেও দে'জ মেডিকাল স্টোরস-এর প্রাধান্য এতটুকু খর্ব হয়নি। ওই দিকটি সামলে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে ভাগ্নে তরুন বসু। নিউমার্কেট অঞ্চলে তিনি সুপরিচিত ছিলেন 'বাচ্চু' নামে। ভূপেনবাবুর পুত্র গৌতম কোম্পানীতে যোগদান করলেন পারচেজ বিভাগে, ১৯৭৪ সালে।

রবীন্দ্রনাথ

১৯৭৫

এল কসমস, কলকাতায় খেলে গেলেন ফুটবল সম্রাট পেলে। আনানোর কৃতিত্ব অবশ্যই ধীরেন্দ্রনাথের।

১৯৭০ সালে সরকারী বিজ্ঞপ্তি এসেছিল ড্রাগ প্রাইস কনট্রোলের। ১৯৭৭ সালে হাতি কমিটির রায় বেরোলো। সমস্ত ওষুধ কোম্পানী দাম কমাতে বাধ্য হল অধিকাংশ উৎপাদনের। এর অর্থই হল কোম্পানীর লভ্যাংশের ওপর বিপুল কুঠারাঘাত। একদিকে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও মানুষের দায়ভার, অন্যদিকে বিশাল ব্যাঙ্ক লোন, উপর্যুপরি রোজকার মার খাওয়া—শুরু

১৯৭৭

হল দে'জ মেডিকাল-এর নতুন সংকট। আবার প্রাইস কন্ট্রোলের আওতার বাইরে থাকা ওষুধ বানানোর লাইসেন্সও সরকার দিতে রাজি ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানীর অভ্যন্তরিণ সমস্যা মেটানোর কাজটা করতে হয়েছিল দক্ষ হাতে। বাইরে থেকে সেটা প্রায় কিছুই টের পাওয়া যায়নি।

১৯৭৯

এই ভয়ানক ডামাডোলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রনজিৎ এবং অমরেন্দ্রনাথের পুত্র শুভার্থী যোগদান করলেন ১৯৭৯-এ। এই সময়ে ওয়ার্কস ম্যানেজার হলেন জে.পি. ঘোষদস্তিদার। রনজিৎ ও শুভার্থী যথাক্রমে কাজ করতেন মেটিরিয়ালস ও পারচেজ দপ্তরে। মালভানিয়া কোম্পানী ছেড়ে গেলেন ১৯৮১ সালে।

দে'জ মেডিকালকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা করলেন ভূপেন্দ্রনাথ। সংস্থার ভিতরকার সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন সবাই। মার্কেটিং-এ রণজিত বিশ্বাস ও পি.কে. সেনগুপ্ত নতুন পরিচালন দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজে। শুরু হল অপ্রয়োজনীয় খরচসাপেক্ষ সবকিছুকে নির্মূল করার যজ্ঞ। নতুন ওষুধ কমবিনা ও সোলাসিড জনপ্রিয়তা পেল। কিন্তু এদের বিক্রির লভ্যাংশ দিয়ে কোম্পানির স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা করা গেল না। শুধু ওষুধ নয়, প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদন করে ক্ষতি সামলানোর ব্লু প্রিন্ট তৈরি হল। কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল বরাবরই তৈরি হত, কিন্তু এবারে ঠিক হল তাকে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে তুলে আনতে হবে। কেয়োকার্পিনকে সম্বল করে বাজার দখলের কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। প্রবল প্রতিদ্বন্দিতার সামনে পড়তে হবে, এটা জানাই ছিল।

১৯৮৩

পারিবারিক সূত্রে পূর্ব পরিচিত বারীদ মজুমদার এলেন কোম্পানীতে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে কাজের সুবাদে আধুনিক বিপনণের কৌশলটা ভালোই জানা ছিল তাঁর। কেয়ো-কার্পিনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাপক বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন তিনি। ভূপেন্দ্রনাথ অনুমোদন দিলেন। ক্ল্যারিয়ন বিজ্ঞাপন সংস্থাকে দায়ীত্ব দেওয়া হল কেয়ো-কার্পিনের প্রচার ও তাকে জনসাধারণের কাছে আদরনীয় করার। এই কাজে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বরুন চন্দ'র। তৈরি হল নতুন প্রেস অ্যাড ও অ্যাড ফিল্ম। বাংলা টিভি সিরিয়াল প্রযোজনার জগতে পথিকৃত হল কেয়ো-কার্পিন।

কেয়ো-কার্পিন তৈরি

নতুন ধারায় আধুনিকতার প্রতীকহিসেবে কেয়ো-কার্পিন ব্র্যান্ডকে সুস্থিত করা হল । 'হাল্কা কেশ তেল', যাতে তেলের সব গুণ রয়েছে, সুগন্ধী অথচ চটচটে নয়—প্রবাদ প্রতীম জনপ্রিয়তায় কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল সমাদৃত হল

দে'জ মেডিকাল স্টোরস

ঘরে ঘরে। বছরে তিরিশ-চল্লিশ শতাংশ বিক্রয় বৃদ্ধি, দু-কোটি টাকা থেকে ১৯৮৯ সালে কুড়ি কোটি টাকায় পৌঁছোলো এর বিক্রি। ভূপেন্দ্রনাথের দূরদর্শিতায় নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হল দে'জ মেডিকাল-এ।

আরও বেশি উৎপাদনের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বণ্ডেল রোড থেকে কেয়ো-কার্পিন তৈরির যন্ত্রপাতি আনা হল দেওদার স্ট্রীটের বাড়ির একতলায়, যেখানে থাকতেন ভূপেন্দ্রনাথ স্বয়ং। ফলে নিজের থাকার জায়গা ছেড়ে দিয়ে সত্তর বছর বয়সে নতুন বাড়ি করে সরে গেলেন তিনি। ভাই ধীরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ওই বাড়িতেই থেকে গেছেন আজীবন।

১৯৮৭

কেয়ো-কার্পিনের সাফল্যে সার্বিকভাবে কোম্পানী স্বাস্থ্যবান হল ঠিকই। কিন্তু ওষুধ উৎপাদনের আঙ্গিনায় মন্দা কাটিয়ে উঠতে পারলো না পুরোপুরি। দে'জ-এর লাভদায়ী ওষুধ এনটোরোস্ট্রেপ নিষিদ্ধ হল সরকার থেকে ১৯৮৭ সালে। কারণ, নতুন নিয়ম অনুযায়ী বেশ কিছু কম্বিনেশন ড্রাগ তখন সরকারী মতে অচল। এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিলেন ভূপেন্দ্রনাথ, মামলায় জিতলেনও। কিন্তু এটা বুঝতে বাকি রইলো না যে এই লড়াই সুদূর প্রসারী হবে না। ওষুধ জনিত লভ্যাংশের পঁচিশ শতাংশ চলে গেলে সংস্থার অস্তিত্ব বজায় রাখা দুষ্কর হবে। তখন সবাইকে ডেকে সংকটের বর্তমান চেহারাটা বললেন। ভবিষ্যতের ভয়াবহতার আভাসও দিলেন। এটাও জানালেন যে যারা এই আসন্ন দুরবস্থায় বিপন্ন হতে রাজি নন, তাঁরা সময় থাকতে অন্যত্র কাজের বন্দোবস্ত করতে পারেন। আশ্চর্য ব্যাপার—ভয় পেয়ে কেউই দে'জ ছেড়ে গেলেন না। চিরকাল সবার পাশে থাকা নির্ভীক সেনাপতিকে সবরকম সহযোগিতার অঙ্গীকার নিয়ে সবাই নেমে পড়লেন রণক্ষেত্রে। এই সময়ে বহু ইন্দ্রিয় যুদ্ধের যোদ্ধা প্রৌঢ় নায়ককে বিচলিত দেখায়নি একবারও।

আয়ুর্বেদে বরাবরই আগ্রহ ছিল ভূপেন্দ্রনাথের। তাই আশি বছর বয়সেও নতুন করে ভাবলেন আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করার কথা। লাইসেন্সের সমস্যা না থাকায় এগোতে অসুবিধা হল না। বিস্তর পুঁথিপত্র ঘেঁটে দে'জ-এর আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিতে তৈরি হল চোখের ওষুধ 'আইটোন'। পলিথিন কন্টেনার, সম্পূর্ণ বিজানুমুক্ত প্যাকেজিং-এর 'আইটোন'-কে বাজার নিয়ে নিলো মহা সমাদরে। অব্যর্থ ঔষধগুন, সার্থক বিপণণ ব্যবস্থা, ডাক্তারদের দ্রুত অর্জিত আস্থাকে সম্বল করে 'আইটোনে'র জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁল। ফলস্বরূপ আবার ঘুরে দাঁড়ালো দে'জ-এর ফারমা ডিভিশন। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তৈরি করা হল বিশেষজ্ঞ আয়ুর্বেদিক টিম। উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন স্বনামধন্য শিবকালি ভট্টাচার্য মহাশয়।

১৯৮৮

কলকাতাবাসী ভূপেন্দ্রনাথকে সম্মান জানালো কলকাতার শেরিফ হিসেবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের IPCA কনভেনশন হল তাঁর সভাপতিত্বে। ওষুধ শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে সম্মানিত করা হল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মারক স্বর্ণপদক দিয়ে।

কর্মময় জীবনে পরিশ্রমের ফলস্বরূপ চূড়ান্ত সম্মান ও খ্যাতির শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাপ্তিরও অভাব ছিল না। পেলেন না শুধু বৃদ্ধ বয়সের আকাঙ্খিত অবসর। সহসাই অসুস্থ হয়ে দেহত্যাগ করলেন বম্বেতে, ১৯৮৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

আইটোন তৈরি

১৯৮৯

দে'জ মেডিকালের পরিচালন ভার গ্রহণ করলেন পরবর্তী প্রজন্ম। এই সময়ে কোম্পানীর অর্থনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার দেখতেন সিদ্ধার্থ মিত্র।

ল্যাবরেটরি

ততদিনে এনটোরোস্ট্রেপ উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ায় প্রথম লোকসানের মুখ দেখলো দে'জ মেডিকাল।

কিন্তু সেই সময়ে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। এ অবস্থায় ভেঙে পড়লেন না কেউই। কারণ আইটোন সহ অন্যান্য ওষুধের অগ্রগতি অব্যাহত। সর্বোপরি কেয়ো-কার্পিন-ও এগিয়ে চলেছে দূর্বার গতিতে, দিলীপ মিত্রর নেতৃত্বে। আরও দেশি চাহিদা মেটাতে তৈরি হল নতুন ফ্যাকট্রি, জোকাতে। এলো নতুন প্রোডাক্ট, কেয়ো-কার্পিন বডি অয়েল।

১৯৯১

এখানে মনে রাখতে হবে যে সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি যথেষ্ট টালমাটাল অবস্থায় ছিল। ১৯৯১-এর খোলা অর্থনীতির জন্য দেশে বাড়লো প্রতিযোগীতা। ওষুধও বাদ গেল না। বহু সংস্থা এই ধাক্কা সামলাতে না পেরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সে সময়ে। কিন্তু দে'জ মেডিকাল সামলে নিল ঝড় ঝাপটা। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দাঁতে দাঁত কামড়ে হাল ধরে রইলেন কোম্পানীর নতুন প্রজন্মের তিন কাণ্ডারী গৌতম, রণজিৎ ও শুভার্থী। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল কোম্পানীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। এই সময়ে কসমেটিক প্রোডাক্ট ডিভিশনের দায়ীত্ব গ্রহন করলেন অলোক মুখার্জী।

১৯৯৫

১৯৯৫ সালে সহজতর হল সরকারের ওষুধ নীতি। বর্ধিত ন্যায্য মূল্য ধার্য্য করা সম্ভব হল। বিক্রিও বাড়লো। এই সময় মার্কেটিং-এ ছিলেন মিঃ এ. এন. গাঙ্গুলি, অসুস্থতার কারণে তিনি বেশিদিন কাজের সময় পাননি। এলেন মিঃ এম. কে. মন্ডল। আধুনিক মার্কেটিং-এর ভাবধারায় দীক্ষিত মানুষ। মার্কেটিং বিভাগকে ঢেলে সাজিয়ে সমকালীন পরিস্থির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ভিতটি স্থাপন করে গেলেন নিপুণ ভাবে। ততদিনে কোম্পানীর পুরোনো লোকজন অধিকাংশই অবসর নিয়েছেন। সংস্থার অগ্রগতিতে লেগেছে নতুন প্রজন্মের উচ্চাকাঙ্খী বাতাস।

২০০০

জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং পদে যোগদান করলেন সৈকতমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। ভবিষ্যতের ভিত শক্ত করতে আনা হল প্রচুর নতুন নতুন প্রোডাক্ট। বাড়ানো হল মার্কেটিং নেটওয়ার্ক।

২০০৩

এদিকে দেওদার স্ট্রীটে কেয়ো-কার্পিন তৈরি করার পরিস্থিতি ক্রমেই প্রতিকূল হয়ে উঠলো। দরকার হল সম্পূর্ণ নতুন এক কারখানার। জমি কেনা হল কসবার কাছে আনন্দপুরে। সাল ১৯৯২। কাজটা সহজ হয়নি, কারণ কলকাতার উপকণ্ঠে পছন্দসই জমির দাম ও দুর্লভতা যে কোনও শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায়। ১৯৯৮ সালে জমি পেয়ে, প্ল্যানিং সেরে নতুন কারখানার উৎপাদন শুরু হয়ে গেলো ২০০৩ সালে। অত্যাধুনিক এই কারখানায় তিনটি অতিদ্রুত বটল-ফিলিং লাইন ক্রমাগত কাজ করে চলেছে শুধুমাত্র কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল উৎপাদনের।

আনন্দপুর ফ্যাকট্রি

এই সময় সরকারী নির্দেশ এল, কারখানার আপগ্রেডেশন প্রয়োজন GMP অনুসারে। তাৎক্ষনিক প্রয়োজন হল প্রচুর মূলধনের। সবে ঘুরে দাঁড়ানো দে'জ মেডিকালের সেই মুহূর্তে ওই ক্ষমতা ছিল না। আবার সবাই এক হলেন। বুঝলেন পরিস্থিতি। আরও উৎপাদন, আরও বিক্রির বর্ধিত লভ্যাংশ দিয়েই এর মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলেন সবাই। সম্পূর্ণ নতুন রুপে সাজলো দে'জ মেডিকাল ফ্যাকট্রি। নতুন প্রজন্মের তিন উত্তরাধিকারী গৌতম, রনজিৎ এবং শুভার্থি র নেতৃত্বে উৎপাদন ও পলিসিগত পরিবর্তন হল সামগ্রিকভাবে।

২০০৫

আজকের দে'জ মেডিকাল একটি ঐতিহ্যময়, আধুনিক ও লাভদায়ী প্রতিষ্ঠান। পুরোনো জমানার যন্ত্রপাতিকে সরিয়ে নতুন প্রযুক্তিকে সুপ্রয়োগ করা হচ্ছে প্রয়োজনমত। বদলাচ্ছে ওষুধের প্যাকেজিং। দেশের সর্বত্র ওষুধের যথেষ্ট যোগান অব্যাহত রাখতে উন্নততর হচ্ছে মার্কেটিং নেটওয়ার্ক।

মার্কেটিং বিভাগের তৎপরতায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে দে'জ মেডিকালের। বয়সে তরুন মেডিকাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের উদ্যমকে ক্রমাগত জোরদার করে চলেছেন অভিজ্ঞ সিনিয়ররা। উন্নত মানের ওষুধ সংক্রান্ত প্রচার ও ডাক্তারদের কাছে সম্যক পরিচিতির ফলে দে'জ-এর ওষুধের চাহিদা আজ ক্রমবর্ধমান। ম্যানেজমেন্ট ও কর্মীবৃন্দের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া ও

নতুন প্রযুক্তি

বডি অয়েল

সহযোগিতার বাতাবরণে দে'জ মেডিকাল আজ একটি সুখী পরিবার।

২০০৮

ছোট্ট পরিসরে শুরু করা ভূপেন্দ্রনাথের স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখেছে ভারতবর্ষের ওষুধ ও প্রসাধনী শিল্প জগতের মানুষ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভেঙে না পড়ে বিচক্ষনতা ও বুদ্ধিমত্তাকে সম্বল করে দে'জ মেডিকাল-এর পুনরুত্থানের কাহিনীও আজ অজানা নয়। সর্বোপরি, সৎভাবে ব্যবসায়ীক সাম্রাজ্যবিস্তারে সবধরণের মানুষের পাশে থেকে, বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করে নিজের ও অন্যের জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে দে'জ গোষ্ঠীর অবদান নজীরবিহীন। দে'জ মেডিকালের ভবিষ্যত জয়যাত্রার চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ রয়েছে ভবিষ্যত প্রজন্মের।

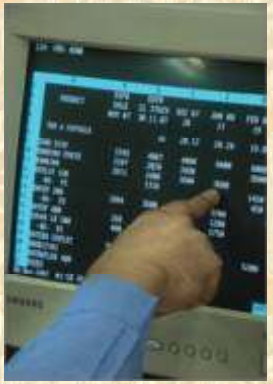

জন্মশতবর্ষে দে'জ মেডিকাল পরিবারের শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনা ও বিন্যাস
শুভময় মিত্র

পরিবেশনা
ঋতি প্রকাশন, কলকাতা

সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে
দে'জ মেডিকাল স্টোরস (ম্যানুফাক্চারিং) লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত
১৫ই জানুয়ারী, ২০০৮

Dey's®
CARE YOU CAN TRUST